সুজন সংবাদ

১৯তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৬

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

এ সংখ্যায় যা থাকছে–

- **প্রবন্ধ**
  - নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা, ড. বদিউল আলম মজুমদার
- **মানববন্ধন**
  - আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা
  - জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মানববন্ধন
- **কার্যক্রম প্রতিবেদন**
  - ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬
- **গোলটেবিল বৈঠক**
  - বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়
  - ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়
  - নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা
- **সংবাদ সম্মেলন**
  - প্রসঙ্গ জেলা পরিষদ আইন

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

নির্বাহী সম্পাদক
সানজিদা হক বিপাশা

সম্পাদনা সহযোগী
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দিলীপ কুমার সরকার
আহসানুল কবীর ডলার

প্রকাশকাল
২০ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
'সুজন' সচিবালয়:
৩/৭, আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১৪ ৬২৭১
ফ্যাক্স : ৯১৪ ৬২৭১
ওয়েব: www.shujan.org ও
www.votebd.org

সম্পাদকীয়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে 'ইসলাম অবমাননা করে' পোস্ট দেয়ার অভিযোগে গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, ভাঙচুর ও নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তীতে ৬ ও ৭ নভেম্বর ২০১৬, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড ও লুটের ঘটনা ঘটে। চারজন আদিবাসীকে গুলি ও পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

বারবার এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আমরা নাগরিক হিসেবে সত্যিই উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত। আমরা মনে করি, এই সকল ঘটনা অনভিপ্রেত, দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। এধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা স্বাধীন বাংলাদেশে কেন বারবার ঘটছে তা আমাদের খতিয়ে দেখা উচিৎ।

অতীতে একই ধরনের গুজব ছড়িয়ে কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার পরও নাসিরনগরের স্থানীয় প্রশাসন কী করে দুটি ধর্মীয় সংগঠনকে সেখানে প্রতিবাদ সমাবেশ করার অনুমতি দেয়, এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। এটা প্রশাসনের চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। পাশাপাশি এই ঘটনাকে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে গণমাধ্যমে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তাও চরম দুর্ভাগ্যজনক। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও হামলার শিকার মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়। তাই সুজন একে প্রশাসনিক ব্যর্থতার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোরও চরম ব্যর্থতা বলে মনে করছে।

আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করে এধরনের ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, প্রকৃত অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেফতার, গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা এবং সারাদেশের কোনো এলাকায় আর যেন ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো ধরনের হামলার ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে যত দ্রুত সম্ভব ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণসহ বাড়ি-ঘর ও মন্দির পুনর্নির্মাণ করে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের আরও আহ্বান, উপরোক্ত দুটি ঘটনায় প্রকৃত অপরাধীরা যেন কোনোভাবেই ছাড় না পায়। পাশাপাশি কোনো নিরপরাধ মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হয়।

সুজন মনে করে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একসাথে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। তাই এসকল ঘটনায় বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে লালিত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতির যে বন্ধন রয়েছে তা আজ হুমকির মুখে পড়েছে।

আমাদের প্রত্যাশা, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র এবং প্রশাসন সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। একইসঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে আমাদের সবাইকে সম্মিলিতভাবে এই হুমকি ও সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং রুখে দাঁড়াতে হবে।

পাশাপাশি সুজন এটাও মনে করে যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষগুলোকেও মনে রাখতে হবে– এ দেশ, এ মাটি আমার। জন্মগতভাবেই আমরা এদেশের নাগরিক। কারো অনুগ্রহে আমরা এখানে বসবাস করছি না। তাই যে কোনো বিপদে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। নিজভূমে পরবাসী না হয়ে, নাগরিক হিসেবে সকল অধিকার নিয়েই প্রিয় এই স্বদেশভূমিতে সকলকে বসবাস করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

এক.

আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তবে সে নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম ও অতি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তবে সে নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসনের প্রথম ও অতি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হলো সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা 'জেনুইন ইলেকশান' বা সঠিক নির্বাচন করতে আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। কারণ আমরা 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও International Covenant on Civil and Political Rights-এ স্বাক্ষরদাতা। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরকে এসব আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তিও মেনে চলতে হবে।

আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি অনুযায়ী জেনুইন ইলেকশানের কতগুলো পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন: (ক) সব ভোটার হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন; (খ) যেসব ব্যক্তি প্রার্থী হতে আগ্রহী, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; (গ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের ফলে ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; (ঘ) ভোট প্রদানে আগ্রহীরা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন; এবং (ঙ) ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা জেনুইন ইলেকশান পরিচালনার জন্য একটি সঠিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। এ লক্ষ্যে আমাদের সংবিধানে নির্বাচন কমিশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে। আমাদের সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে চারটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যেগুলো হলো: (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান; (খ) জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান; (গ) সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণ; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ। এসব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের কর্তব্য হলো, আমাদের সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কমিশনকে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদান করা।

দুই.

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের নির্দেশনা দেওয়া আছে। "১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা: (১) 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া' বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।" সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে পুনঃনিয়োগ প্রদানের কোনো সুযোগ নেই। তবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

সংবিধানের উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক অন্য চার নির্বাচন কমিশনাকে নিয়োগ প্রদানের এখতিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতির। তবে রাষ্ট্রপতিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই এ নিয়োগ দিতে হয়। উল্লেখ্য, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে হয় [অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)]।

লক্ষণীয় যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে 'আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে' রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা গত ৪৪ বছরেও মানা হয়নি। তাই সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন না করে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা না হলে, সেই নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সাম্প্রতিক এক আলোচনা সভায় ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, যিনি আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের একজন ছিলেন, এব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে 'আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে' রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যা গত ৪৪ বছরেও মানা হয়নি। তাই সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন না করে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা না হলে, সেই নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো মূলত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ড কর্মের শর্তাবলী নির্ধারিত করে দেওয়া, যাতে জেনুইন বা সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। তবে সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কমিশন গঠন করতে হলে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। আর সঠিক পদ্ধতি হবে সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী এলক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা, যাতে সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিরা কমিশনে নিয়োগ পান। অতীতে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিক ব্যক্তিদেরকে কমিশনের নিয়োগ না দেওয়ার কারণে সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কমিশনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

তিন.

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ২৩টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন পুনঃগঠন বিষয়ে সংলাপ করে একটি আইন প্রণয়ন অথবা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কমিশনে নিয়োগ দেওয়ার লক্ষ্যে পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতি, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম-কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়েএই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন।

তবে কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের সংবিধানিক

নির্দেশনা উপেক্ষা করে মন্ত্রিপরিষদ ২১ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে চার সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ঘোষণা সম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জারি করা আরেকটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুসন্ধান কমিটির সদস্য হিসেবে আপিল বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ নূরুজ্জামান, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব আহমেদ আতাউল হাকিম এবং সরকারি কর্ম-কমিশনের চেয়ারম্যান এটিএম আহমেদুল হক চৌধুরীর নাম ঘোষণা করা হয়। প্রজ্ঞাপনে অনুসন্ধান কমিটিকে তাদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে শুধু সংবিধানই নয়, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশকেও উপেক্ষা করা হয়। এছাড়াও মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গঠিত অনুসন্ধান কমিটির কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অতীতের দলীয় সম্পৃক্ততার অভিযোগও উত্থাপিত হয় (*প্রথম আলো*, ৩০ জানুয়ারি ২০১২)।

চার.

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ নিয়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক বিরোধ বিরাজমান। অতীতের প্রায় সকল নিয়োগ নিয়েই, বিশেষত দলীয় সরকারের অধীনে নিয়োগ নিয়ে পক্ষপাত দুষ্টতার অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগের অন্যতম কারণ হলো যে, অতীতে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ব্যক্তিদেরকে কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আর এই রাজনৈতিক বিতণ্ডা এড়ানোর লক্ষ্যে সম্প্রতি সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনা কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন (*প্রথম আলো*, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬), যার সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে বিতর্ক এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা সংবিধান অনুসরণ করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

আমাদের প্রস্তাব হবে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রথমেই একটি আইন প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত গত নির্বাচন কমিশনের – যে কমিশন কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল – রেখে যাওয়া কমিশনে নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া কাজে লাগানো যেতে পারে। খসড়াটি নিয়ে রাজনৈতিক দলসহ সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সংলাপের আয়োজন করে এটিকে চূড়ান্ত করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি এব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে।

আমাদের প্রস্তাব হবে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রথমেই একটি আইন প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত গত নির্বাচন কমিশনের – যে কমিশন কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল – রেখে যাওয়া কমিশনে নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের একটি খসড়া কাজে লাগানো যেতে পারে।

বর্তমান খসড়াটিতে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব রয়েছে, যে প্রস্তাবের সঙ্গে আমরা একমত। আমরাও প্রস্তাবিত আইনে পাঁচ সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডা এড়ানোর লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে কমিটির সদস্য করার প্রস্তাবের সঙ্গেও আমরা সহমত। একইসঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আমরা এতে নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করা যৌক্তিক বলে মনে করি। প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে সভাপতি করে ক্ষমতাসীন দলের একজন, প্রধান বিরোধী দলের একজন, নাগরিক সমাজের একজন এবং গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি নিয়ে পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আমরা সুস্পষ্ট প্রস্তাব করছি। (ভবিষ্যতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রী মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনুসন্ধান কমিটিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যেতে পারে।) এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদ্বয়ের বিরুদ্ধে দলপ্রীতির কোনো বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ যেন না থাকে।

অনুসন্ধান কমিটিকে অবশ্যই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। স্বচ্ছতার খাতিরে কমিটি নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দানের জন্য জনগণের কাছে নাম সুপরিশ করার আহ্বান করতে পারে। এভাবে যাঁদের নাম সুপারিশ করা হয় তাঁদের সম্মতির ভিত্তিতে আইনে বর্ণিত যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ডের আলোকে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগের যোগ্য সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নামের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করে গণশুনানির আয়োজন করতে পারে। গণশুনানিতে এ নাগরিকদের পক্ষে অনুসন্ধান কমিটির বিবেচনাধীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট আপত্তি থাকলে তা উত্থাপন করার সুযোগ থাকবে। গণশুনানির পর অনুসন্ধান কমিটি প্রত্যেক শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন করে চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ দশজনের নামের একটি প্যানেল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। একইসঙ্গে প্রেরণ করবে কোন যুক্তির/মানদণ্ডের ভিত্তিতে তারা প্যানেলটি তৈরি করেছেন তার একটি রিপোর্ট, যা নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হবে।

প্রধান বিচারপতি মনোনীত আপিল বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে সভাপতি করে ক্ষমতাসীন দলের একজন, প্রধান বিরোধী দলের একজন, নাগরিক সমাজের একজন এবং গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি নিয়ে পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আমরা সুস্পষ্ট প্রস্তাব করছি।

দশজনের নামের প্যানেল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ পাঁচজনের নাম সুপারিশ করবেন, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত একজন নারী যেন নিয়োগ প্রাপ্ত হন। লক্ষণীয় যে, নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হলে অপেক্ষাকৃত যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ পাবার পথ সুগম হবে এবং এ ব্যাপারে বিতর্ক এড়ানো যাবে বলে আমরা মনে করি।

দশজনের নামের প্যানেল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ পাঁচজনের নাম সুপারিশ করবেন, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত একজন নারী যেন নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

তবে সর্বাধিক সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে না, যদি না প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না করে এবং রাজনৈতিক দলগুলো দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন না করে। অর্থাৎ সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিকভাবে গঠিত সঠিক নির্বাচন কমিশন অপরিহার্য বা 'নেসেসারি' (necessary) হলেও তা যথেষ্ট বা 'সাফিশিয়েন্ট' (sufficient) নয়। অর্থাৎ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠিত হলেই চলবে না, এর জন্য আরও প্রয়োজন হবে সরকারের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীলতা।

সুজন-এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস উদ্‌যাপন

২ অক্টোবর, আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস। ২০০৭ সালের ১৫ই জুন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্মদিনকে আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

ছবি: মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা, শাহবাগ, ঢাকা।

'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর উদ্যোগে ২০১৫ সালে দিবসটি প্রথম অহিংস দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছরেও 'সংঘাত নয়, জঙ্গিবাদ নয় – এসো ঐক্য ও সম্প্রীতির স্বদেশ গড়ি– শ্লোগানকে সামনে রেখে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা তথা বিশ্বমানবতার শান্তির সপক্ষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানে গত ২ অক্টোবর ২০১৬, সকাল ১০.৩০টা থেকে ১১.৩০টা পর্যন্ত একযোগে ঢাকাসহ সারাদেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সুজন ও 'নির্বাচনী সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিক (PAVE)'-এর উদ্যোগে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

রাজধানী ঢাকায় দিবসের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে ছিল সকাল ১১:৩০ থেকে ১১:৩০ পর্যন্ত শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে মানববন্ধন এবং মানববন্ধন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি পর্যন্ত শান্তি পদযাত্রা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজমুদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সুজন জাতীয় কমিটির সদস্য রোবায়েত ফেরদৌস, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সুভাষ সিংহ রায়, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সংগঠক জনাব মিহির বিশ্বাস, আদি ঢাকাবাসী ফোরামের জনাব জাভেদ আক্তার, নাগরিক উদ্যোগ-এর প্রতিনিধি মাহবুব আক্তার জুয়েল, এসো মিলি করি'র প্রতিনিধি মিলি জাকারিয়া, সুজন ঢাকা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবুল হাসানাত, সুজন ধানমন্ডি থানার সভাপতি জুবায়ের নাহিদ, সুজন লালবাগ থানার সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম, জনাব শাহজাহান মন্টু এবং জনাব আনিসুল হক প্রমুখ। বক্তব্য প্রদানসহ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার। সংহতি প্রকাশ করে নাগরিক উদ্যোগ, এসো মিলে করি, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন, আদি ঢাকাবাসী ফোরাম এবং সুবন্ধন সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি সংগঠন।

মানববন্ধনে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'শান্তির পথ হলো মুক্তির পথ। অশান্তি আমাদেরকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়। আমরা যদি শান্তিতে থাকতে চাই তাহলে সহিংসতা ও প্রতিহিংসার পথ ছেড়ে আমাদেরকে অহিংসার পথ অবলম্বন করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী বলে গিয়েছেন, চোখের বদলে চোখ তুলে নিলে আমরা এক অন্ধকার পৃথিবী পাবো।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের অধিবেশনে জঙ্গিবাদমুক্ত সম্প্রীতির এক বিশ্ব গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। তাঁর সাথে একমত পোষণ করে আমরাও বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদমুক্ত শান্তি-সম্প্রীতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।'

জনাব রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, 'মহাত্মা গান্ধী আজীবন অহিংসার বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। আজ ভারত-পাকিস্তান দুটো রাষ্ট্রই যুদ্ধের মুখোমুখি। কিন্তু যুদ্ধ শান্তি আনতে পারে না। শান্তি আনয়নের জন্য প্রয়োজন অহিংসতার নীতি ধারণ করা।'

জনাব দিলীপ কুমার সরকার বলেন, 'বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় 'আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস' উদ্‌যাপনকে গভীর তাৎপর্যবহ একটি কর্মসূচি হিসেবে আমরা মনে করি। নিকট অতীতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কল্পনা করলেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র। এ অবস্থায় দেশের প্রতিটি নাগরিক যদি স্ব স্ব অবস্থান থেকে জেগে না উঠে, তবে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাই অহিংসার বাণী এবং শান্তি ও সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে।'

দিবসের কর্মসূচি থেকে– ■ সংঘাত নয়, এসো ঐক্যের বাংলাদেশ গড়ি; ■ সহিংসতা বন্ধ করি, সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি; ■ অহিংস নীতি গ্রহণ করি, শান্তির দেশ গড়ে তুলি; ■ অহিংস নীতি গ্রহণ করি, শান্তি-সম্প্রীতির বিশ্ব গড়ি; ■ হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করি, সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলি; ■ সন্ত্রাস ও সহিংসতা বন্ধ করি, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ি; ■ ভোগের সংস্কৃতি বর্জন করি, ত্যাগের সংস্কৃতি গড়ে তুলি; ■ ভোগবাদিতা নয়, রাজনীতিতে চাই ত্যাগের সংস্কৃতি; ■ গণতান্ত্রিক চেতনা লালন করি, শান্তিময় দেশ গড়ি; ■ দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় চাই আদর্শবাদী রাজনীতি ইত্যাদি আহ্বান তুলে ধরা হয়।

ঢাকা ছাড়াও সুজন-এর উদ্যোগে ৫৫টি জেলায় আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস-২০১৬ পালন উপলক্ষে মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায়

জাতীয় ঐক্যের আহ্বানে সুজন-এর উদ্যোগে মানববন্ধন

গত ১ জুলাই ২০১৬ তারিখে গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি এবং ৬ জুলাই ২০১৬ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের দিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। গুলশানের হামলায় ১৯ জন বিদেশি নাগরিক ও ৫ জঙ্গি-সহ ২৯ জন এবং শোলাকিয়ায় দুই পুলিশ সদস্য, এক গৃহবধূ ও এক জঙ্গি নিহত হয়। শুধু তাই নয়, ২০১৩ থেকেই জঙ্গিগোষ্ঠী শুরু করে মুক্তচিন্তার লেখক, প্রকাশক, সংস্কৃতিকর্মী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভিন্ন জীবনধারার অনুসারীদের টার্গেট করে ধারাবাহিক এসব হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকে।

এমনি এক প্রেক্ষাপটে নাগরিক সংগঠন সুজন জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং একটি উদার, সহিষ্ণু ও বহুত্ববাদী সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তির জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বানে গত ১৬ জুলাই ২০১৬ সকাল ১০.৩০টা থেকে ১১.৩০টা পর্যন্ত একযোগে ঢাকা-সহ সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মানববন্ধনের ডাক দেয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারাদেশের ৪৯টি জেলা ও ৬১টি উপজেলায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন থেকে– ■ অবিলম্বে জঙ্গিবাদী অপতৎপরতা কঠোর হাতে দমন; ■ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা; ■ জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে অবিলম্বে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা; ■ উদার, সহিষ্ণু ও বহুত্ববাদী সমাজ গঠনে উদ্যোগী হওয়া; ■ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ-সহ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; ■ রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করা-সহ গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা; ■ অবিলম্বে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা ইত্যাদি আহ্বান জানানো হয়।

ঢাকার মানববন্ধনটি শাহবাগে (জাতীয় জাদুঘরের সামনে) অনুষ্ঠিত হয়। এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সুজন নির্বাহী সদস্য সৈয়দ আবুল মকসুদ; সুজন নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম সাখাওয়াত হোসেন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, সুজন সহ-সম্পাদক জনাব জাকির হোসেন, জাতীয় কমিটির সদস্য মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমদ, জাসদ (রব) এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল মালেক রতন, সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক হুমায়ূন কবির হিরু, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম-এর সম্পাদক জনাব নাছিমা আক্তার জলি, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের ড. মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন-এর জনাব মিহির বিশ্বাস, ব্রতী'র প্রতিনিধি জনাব রঘুনাথ রাহা, নাগরিক উদ্যোগ-এর জনাব মাহবুব আক্তার জুয়েল এবং সুজন ঢাকা জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব আবুল হাসনাত, জনাব শাহজাহান মন্টু, জনাব মোহাম্মদ সেলিম, জনাব ক্যামেলিয়া চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালনা করেন সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

মানববন্ধনে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'জঙ্গিরা কারো বন্ধু হতে পারে না, তারা মানবতার শত্রু। এদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে। তবে, এ নিয়ে রাজনীতি করলে তার পরিণতি ভাল হয় না।' তিনি বলেন, 'জঙ্গিবাদ নিরসনে সরকারের জিরো টোলারেন্স নীতি কাজ করছে না। শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করা যাবে না। জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে এবং জঙ্গিদের মতের বিপক্ষে সুচিন্তিত ও বিকল্প ন্যারেটিভ বা প্রস্তাবনা দাঁড় করাতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে, তাদের মত ঠিক নয়।' জঙ্গিবাদের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা নিজেদের নির্যাতিত মনে করে। এছাড়া আমাদের বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, যা জঙ্গিবাদের উত্থানের পেছনে উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করছে।'

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'শুধু বাংলাদেশেই নয়, উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটেছে। শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারের একার পক্ষে এর মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। এজন্য আজ প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য ও জনগণের একাত্মতা।' তিনি আরও বলেন, 'জঙ্গিবাদের সবচেয়ে নৃশংস শিকার সাধারণ জনগণ। তাই সাধারণ জনগণকেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।'

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'জঙ্গিবাদও একধরনের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের ভাষা সশস্ত্র ও সহিংস; যা সঠিক নয়। তবে এও ঠিক যে, জঙ্গিবাদ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা – যে গণতন্ত্র হবে জবাবদিহিতামূলক।'

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক সমস্যা। আমরা সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করতে পারছি না। বরং এখানে জঙ্গিবাদকে রাজনৈতিক আবরণ দেয়া হচ্ছে। অথচ এ সমস্যা আমাদের সমাজের, রাষ্ট্রের।' তিনি বলেন, 'মতবাদ সমস্যা না। মতবাদ যখন সশস্ত্র রূপ নেয়, তখনই এটা জঙ্গিবাদ রূপ নেয়। তাই শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ করে এর সমাধান করা যাবে না। এজন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'জঙ্গিবাদ বৈশ্বিক সমস্যা হলেও দেশীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে।' তিনি বলেন, 'ধর্ম থাকবে, অপর ধর্মের প্রতি ভালবাসা থাকবে এবং উদারনৈতিকতা থাকবে– আমরা এ রকম একটি পরিবেশ চাই।'

জনাব নাছিমা আক্তার জলি, 'অতীতের বিভিন্ন সংকটকালীন মুহূর্তে আমাদের যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু বর্তমানে তরুণদের একটি অংশ জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাই আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে তরুণদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখার। তারা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে? কারণ তাদের একজনও পথভ্রষ্ট হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সবার বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলেন, 'গুলশানের আর্টিজান হোটেলে হামলার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা মোকাবিলায় তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়।' তিনি বলেন, 'আজ সময় এসেছে, জঙ্গিবাদের মোকাবিলায় সরকার, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের কার কী ভূমিকা রয়েছে তা নির্ধারণ করার।'

উল্লেখ্য, একই দাবিতে ঢাকা ছাড়াও ৬১টি উপজেলায় মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬: সুজন পরিচালিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

ব্যাপক সহিংসতা, অনিয়ম ও বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বিগত ২২ মার্চ ২০১৬ থেকে শুরু করে ৪ জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ছয় ধাপে সম্পন্ন হয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬। সর্বমোট ৪৫৫৩টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের বিশেষত্ব ছিল, এই প্রথমবার রাজনৈতিক দলভিত্তিকভাবে এবং দলীয় প্রতীকে চেয়ারম্যান পদে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন মূলত দুই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে একটি ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান এবং নির্বাচনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার জন্য 'সংবাদ সম্মেলন'। অপরটি 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'। সুজন পরিচালিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. সংবাদ সম্মেলন: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০১৬ উপলক্ষে সুজন মোট ছয়টি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। ছয় ধাপের নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঁচটি এবং নির্বাচন শেষ হওয়ার পর নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়ন তুলে ধরে আরেকটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনগুলো ২ মার্চ ২০১৬, ২৮ মার্চ ২০১৬, ১৯ এপ্রিল ২০১৬, ৫ মে ২০১৬, ২৬ মে ২০১৬ এবং ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

২. জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান: ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সুজন-এর উদ্যোগে সারাদেশের সর্বমোট ৮৭টি ইউনিয়নে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুখোমুখি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল, ১. অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি; ২. প্রার্থী, দল ও সমর্থকদের মধ্যে মরিয়া হয়ে জয়ের প্রচেষ্টার পরিবর্তে নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি এবং ৩. সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী বাছাইয়ে ভোটারদের সহায়তা করা।

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের বক্তব্যে প্রত্যাশা, পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছেন, অপরদিকে ভোটাররাও বিভিন্ন প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানে জনস্বার্থেকে বিবেচনায় রেখে 'সুজন' কর্তৃক প্রণীত অঙ্গীকারনামা পাঠ করে শোনানো হয় এবং একমত পোষণ সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামায় চেয়ারম্যান প্রার্থীদের স্বাক্ষর নেয়া হয়। অঙ্গীকারসমূহের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের পরস্পরের হাত ধরে শপথ বাক্য উচ্চারণ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

৩. অন্যান্য: উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও সুজন-এর সভাপতি জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান, সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, নির্বাহী সদস্য ড. তোফায়েল আহমেদ ও সৈয়দ আবুল মকসুদ, কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার বিভিন্ন টেলিভিশন টক শো এবং পত্র পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের সপক্ষে সাংগঠনিক বক্তব্য তুলে ধরেন।

সুজন-এর উদ্যোগে বিভিন্ন ইস্যুতে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টির কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করে আসছে 'সুজন'। এলক্ষ্যে নিয়মিতভাবে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন সংগঠনটির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০১৬ সালে সুজন-এর উদ্যোগে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। গোলটেবিল বৈঠকের বিষয়সমূহ ছিল: ■ **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়** ■ **ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় এবং** ■ **নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা**। আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

বিচার বিভাগ, নির্বাহী ও আইন বিভাগ থেকে পৃথক হওয়ার পাশাপাশি বিচার কার্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক পরও আমরা প্রতিনিয়ত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছি। অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন আছে, স্বস্তি নেই, আছে উৎকণ্ঠা। গত৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ‘সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর উদ্যোগে ‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে করণীয়’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে সুজন নেতৃবৃন্দ এ মন্তব্য করেন। সুজন সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন ড. কামাল হোসেন, বিচারপতি আব্দুল মতিন, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, সুজন নির্বাহী সদস্য সৈয়দ আবুল মকসুদ, জনাব আলী ইমাম মজুমদার, ড. তোফায়েল আহমেদ, জনাব আবুল হাসান চৌধুরী, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা, অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ মহসেন রশিদ, অ্যাডভোকেট হাসান তারিক চৌধুরী, জনাব জাকির হোসেন, সুজন জাতীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর এবং জনাব হুমায়ূন কবীর হিরু প্রমুখ।

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুজন নির্বাহী সদস্য ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. শাহদীন মালিক। তিনি বলেন, ‘১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগ ছিল নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পৃথকতা উভয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার পথে বিচার বিভাগ যাতে অন্তরায় না হতে পারে সেই যুক্তিতে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বরখাস্ত, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি সব ক্ষমতাই ন্যস্ত করা হয় একচ্ছত্রভাবে রাষ্ট্রপতির ওপর। এমনকি ৯৬(৩) অনুচ্ছেদের বিচারপতিদের অব্যহতি সংক্রান্ত সংসদের আইন করার যে ক্ষমতার উল্লেখ ছিল সেটার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। অর্থাৎ বিচারপতিদের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৫ এ বিচারপতিদের স্বাধীনতা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন করার যে অধ্যায় সেখান থেকে গত ৪০ বছরে আমাদের যাত্রা ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত যে বিধি-বিধান ছিল সেটা পুনরুদ্ধার বা শুরুর পর্যায়ে ফিরে যাবার যাত্রা। তবে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার যে বিধান ছিল সেখানে আমরা এখনো সম্পূর্ণ ফিরে যেতে পারি নাই।’

প্রবন্ধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ করা হয়। যথা– সংবিধানের ৯৫(২)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচারপতি নিয়োগের স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য আইন প্রণয়ন করা; সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৫, ১১৬ প্রতিস্থাপন করে বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ নিশ্চিতকরণ; সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের জন্য সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বা বিচার বিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা স্থাপন করা; উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন বিচারপতিকে সার্বক্ষণিকভাবে বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের দায়িত্ব পালন; মামলার জট কমানো ও বিচার প্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য বার ও বেঞ্চের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ; বিচারক-সহ বিচারবিভাগের সকল স্তরে কর্মকর্তাদের জন্যে অর্থপূর্ণ প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা; এবং বিচার বিভাগের জন্য বাজেট বাড়ানো।

ড. কামাল হোসেন বলেন, ‘অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের সংবিধান পেয়েছি। এ সংবিধানের রক্ষক হলো সুপ্রিম কোর্ট। তাই সুপ্রিম কোর্টকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এদেশের মানুষের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। তাই জনগণ দেশের মালিক নয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীন থাকবে না– এ ধরনের ঘোষণা দেয়া হলে জনগণ মেনে নেবে না।’ তিনি বলেন, ‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মানে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারপতিদের নিয়োগ দান এবং সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। অথচ দীর্ঘ সময় পার হলেও বাংলাদেশের এখনো বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন হয়নি, যে কারণে যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে না হয়ে দলীয় ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।’ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে কারো অধিকার সুরক্ষিত থাকে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিচারপতি আব্দুল মতিন বলেন, ‘সার্বজনীন মানবাধিকায় ঘোষণায় প্রত্যেক নাগরিকের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু সে বিচার হতে হবে স্বাধীনভাবে।’ তিনি বলেন, ‘বিচারপতিদের নিয়ে সংসদে আলোচনা করা যাবে না এবং ব্যক্তিগত ডিনারে আহ্বান করা যাবে না– ভারতে এ ধরনের আইন থাকলেও আমাদের এখানে এ ধরনের আইন নেই। আমি মনে করি, এ ধরনের সংস্কৃতি বন্ধ করা দরকার। না হয় বিচারপতিরা স্বাধীনভাবে রায় দিলেও জনগণের মধ্যে বিচার বিভাগের প্রতি এক ধরনের অনাস্থা তৈরি হবে।’

এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, ‘আমরা বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও কার্যকর দেখতে চাই। কিন্তু কলুষিত রাজনীতি বিরাজমান থাকলে বিচার বিভাগ স্বাধীন হবে না। এ অবস্থায় দুর্নীতি রোধ করা এবং রাজনৈতিক সংস্কার দরকার, যাতে বিচার বিভাগকেও স্বাধীন করা যায় এবং মানুষ ন্যায়বিচার পায়।’

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, ‘দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা দরকার।

এছাড়া বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। কিন্তু আমাদের বিচার বিভাগ দরিদ্র ও দুর্বল বান্ধব নয়।' এ অবস্থায় আমাদের বিচার বিভাগকে ক্ষমতাবান্ধব না হয়ে দুর্বলবান্ধব হওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'বিচার বিভাগ পরিপূর্ণ স্বাধীন না হওয়ায় দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি রয়েছে এবং বিভিন্নভাবে মানুষ বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'গ্রাম সরকার আইন নিয়ে আরও ভাবা দরকার। বিশেষ করে একে সালিশী আদালত না বলে ভিলেজ কোর্ট বলার যৌক্তিকতা আছে কিনা তাও ভাবা দরকার।'

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'সাবেক একজন বিচারপতি যেভাবে প্রধান বিচারপতিকে আক্রমণ করে চলেছেন তা স্বয়ং বিচার বিভাগকে হেয় করার শামিল।' বিচার বিভাগ স্বাধীন না হলে মানুষ বঞ্চিত না হলে মানুষ বঞ্চিত হয় মন্তব্য করেন তিনি।

'ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

'বিগত বছরগুলোতে ব্যাংকিং খাতে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে জনমনে তৈরি হয়েছে আস্থাহীনতা ও উৎকণ্ঠা। দেশের অর্থনীতির কল্যাণে এ সকল অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা আজ অত্যন্ত জরুরি' বলে মন্তব্য করেছেন দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদগণ। তাঁরা গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর উদ্যোগে'ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এ মন্তব্য করেন।

সুজন সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর সভাপতিত্বে ও সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব মির্জা আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবু আহমেদ, ড. সাজ্জাদ জহির, সুজন নির্বাহী সদস্য জনাব আলী ইমাম মজুমদার ও ডা জাফরুল্লাহ চৌধুরী, জনাব নুরুল হক মজুমদার এবং জনাব আব্দুল্লাহ ক্বাফী রতন প্রমুখ।

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফিনএক্সেল-এর চেয়ারম্যান ও অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমদ। তিনি বলেন, 'ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম বাধা। নিকট অতীতে পুঁজিবাজার, হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, বেসিক ব্যাংক ও ডেসটিনি কেলেঙ্কারি সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা চুরির ঘটনা। ভবিষ্যতে এ সকল ঘটনা উত্তরণে এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ খাতের বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে প্রয়োজন সমস্যাগুলো উত্তরণে করণীয় নির্ধারণ করা।'

তিনি প্রবন্ধের শুরুতে ব্যাংকিং খাতে বিদ্যমান কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। সমস্যাগুলো হলো– ১. বিনিয়োগ না বাড়ায় ব্যাংকগুলোতে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত পড়ে থাকা; ২.ব্যাংকগুলো যে ঋণ দিচ্ছে তা আদায় করতে না পারা, কিংবা কাকে ঋণ দেয়া হবে তা নিয়ে সংকট তৈরি হওয়া; ৩. ব্যাংকিং খাতের নানা অনিয়ম ও জালিয়াতি; ৪. ব্যাংকগুলোর কেবল লাভের পেছনে ছোটা; ৫. বিপুল অঙ্কের খেলাপি ও মন্দ ঋণ, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে; ৬. ব্যাংকগুলোর আইটি সিস্টেম সুরক্ষিত না থাকা; ৭. মূলধন ঘাটতি, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে; ৮. আমানত সংগ্রহে অসম প্রতিযোগিতা; ৯. ব্যবস্থাপনার সংকট, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর; ১০. সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ব্যাংকগুলোতে পরিচালকদের অযাচিত হস্তক্ষেপ; ১১. বাংলাদেশ ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে সিবিএ নেতাদের দৌরাত্ম্য।

প্রবন্ধে বলা হয়, 'গত দেড় দশকে ব্যাংকিং খাতে নয়টি বড় ধরনের আর্থিক কেলেঙ্কারি হয়েছে। আর গত সাত বছরে ঘটা ছয়টি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি চুরি বা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বড় এসব আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ। কিন্তু একটি কেলেঙ্কারিরও বিচার হয়নি। উলে-খযোগ্য কারো শাস্তি হয়নি এখনও।' এ সময় তিনি ব্যাংকিং খাতে ঘটে যাওয়া নয়টি বড় কেলেঙ্কারির বিস্তারিত বিবরণ এবং ছোট-খাট আরও কিছু অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন।

প্রবন্ধের শেষভাগে বলা হয়, 'দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো ব্যাংকিং খাত। তাই অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করে এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কিছু করণীয় রয়েছে। করণীয়গুলো হলো– ১. ব্যাংকিং কমিশন গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া; ২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা; ৩. বেসরকারি ব্যাংকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা; ৪. ব্যাংকিং খাতের জালিয়াতি বন্ধ করা; ৫.আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য অভ্যন্তরীণ অডিট করা; ৬. পরিচালক নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠন; ৭. ব্যাংকিং খাতকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা; ৮. অতীতের বিভিন্ন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনগুলো বাস্তবায়ন করা; ৯. ট্রেড ইউনিয়নের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা ১০. সৎ-নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করা; ১১. খেলাপি ঋণ রোধে ট্রাইব্যুনাল গঠন; ১২. যথাযথ প্রক্রিয়ায় ঋণ অনুমোদন করা; ১৩. আর্থিক বিধি-বিধানগুলো অনুসরণ করা; ১৪. মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিরাপদ

করা; ১৫. টাকা পাচার রোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ১৬. ব্যাংকিং খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সাথে মতবিনিময় করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা; ১৭. সচেতনতা বৃদ্ধি করা।'

এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, 'ব্যাংকিং খাতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এ খাতে সুশাসনের অভাব রয়েছে। কী কারণে আজ এ অবস্থা তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। দলীয়করণ ও রাজনীতি ব্যাংকিং খাতকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।' তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্তৃত্ব ও নজরদারি অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আছে কি না সে বিষয় নিয়েও সন্দেহ পোষণ করেন।

মির্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা যে কম আছে তা নয়, ক্ষমতা যতটুকু আছে তার কতটুকু প্রয়োগ করছে তা বিবেচ্য বিষয়। ক্ষমতার প্রয়োগের জন্য যথাযথ ও যোগ্য লোক নিয়োগ প্রদান করতে হবে।' তিনি ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ অডিট নিয়মিত করা, ব্যাংকগুলো যাতে বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে সেদিকে নজর রাখা, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কাকে ঋণ প্রদান করা হবে সেটি বিবেচনায় আনা এবং ঋণ আবেদনকারীর তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নীতিমালা যা আছে তা আর্ন্তজাতিক মানের। এই নিয়ম/নীতিমালা আমাদেরকে পালন করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংক নিয়ন্ত্রণে একটা ভারসাম্য আনতে হবে।' তিনি বলেন, 'ব্যাংকিং খাতে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ মানুষকে নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং আর্থিক খাতের অনিয়মের বিচার করতে হবে। তা না হলে অনিয়মের ঘটনা এড়ানো সম্ভব নাও হতে পারে।' আর্থিক খাতের মত একটি খাতে যদি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয় তাহলে সে খাত ধ্বংস হতে বাধ্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমাদের আর্থিক খাতে বিচারহীনতা ও বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে, আর এ অবস্থা চলতে থাকলে রিজার্ভের টাকা চুরি, বেসিক ব্যাংক, হলমার্ক ও পুঁজি বাজার কেলেঙ্কারির মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।'

'নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

রাজনৈতিক বিতণ্ডা এড়ানোর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক দলকে সম্পৃক্ত করা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়নেরও দাবি জানান। গত ১৫ অক্টোবর ২০১৬, সকাল ১০.০০টায়, জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকে সুজন নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান।

সুজন সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খান-এর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এ. টি. এম শামসুল হুদা, সাবেক নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সুজন নির্বাহী সদস্য ড. হামিদা হোসেন, ড. শাহদীন মালিক, সৈয়দ আবুল মকসুদ, জনাব আলী ইমাম মজুমদার, অধ্যাপক আসিফ নজরুল, রাজনীতিবিদ জনাব শেখ শহিদুল ইসলাম, জনাব এ এস এম আকরাম, হুমায়ূন কবীর হিরু এবং সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য তথা জেনুইন ইলেকশান পরিচালনার জন্য একটি সঠিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। এ লক্ষ্যে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে 'আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে' রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে কমিশনার নিয়োগ দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। কমিশনে নিয়োগ দেয়ার জন্য একটি আইন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা থাকলেও গত ৪৪ বছরেও মানা হয়নি। তাই সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন না করে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা না হলে, সেই নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।'

তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো মূলত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ড ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারিত করে দেয়া, যাতে জেনুইন বা সঠিক নির্বাচনের জন্য সঠিক ব্যক্তিদেরকে নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। অতীতে সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিক ব্যক্তিদেরকে কমিশনের নিয়োগ না দেয়ার কারণে সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কমিশনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।'

তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বাক-বিতণ্ডা এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে কমিটির সদস্য করার প্রস্তাব করছি। একইসঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে আমরা এতে নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব করছি। অনুসন্ধান কমিটিকে অবশ্যই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। স্বচ্ছতার খাতিরে কমিটি নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দানের জন্য জনগণের কাছে নাম সুপরিশ করার আহ্বান করতে পারে। এভাবে যাঁদের নাম সুপারিশ করা হয় তাঁদের সম্মতির ভিত্তিতে আইনে বর্ণিত যোগ্যতা-অযোগ্যতার মানদণ্ডের

আলোকে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগের যোগ্য সম্ভাব্য ব্যক্তিদের নামের একটি শর্টলিস্ট তৈরি করে গণশুনানির আয়োজন করতে পারে। গণশুনানির পর অনুসন্ধান কমিটি প্রত্যেক শূন্য পদের বিপরীতে দুইজন করে চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ দশজনের নামের একটি প্যানেল রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবে। দশজনের নামের প্যানেল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ পাঁচজনের নাম সুপারিশ করবেন, যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ প্রদান করবেন। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত একজন নারী যেন নিয়োগ প্রাপ্ত হন।'

এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, 'অতীতে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বর্তমানে দেশে নির্বাচনীব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে কাজ করছে না। মূলত সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দরকার স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের সদিচ্ছা।' তিনি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবি জানান।

ড. এ. টি. এম শামসুল হুদা বলেন, 'আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থার অভাব রয়েছে। যে কারণে যারা হেরে যান তারা কারচুপির অভিযোগ আনেন। তাই নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থার অভাব নিরসন করতে হবে এবং নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেয়ার সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, 'অনেক দেশেই রাজনৈতিক দলের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। সবার অংশগ্রহণে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে পরে কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে কারো আপত্তি থাকে না।' যাদের বিরুদ্ধে দলপ্রীতির অভিযোগ নেই এবং যাদের সুনাম রয়েছে তারাই ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, 'কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নির্বাচন কমিশন হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মূল কেন্দ্র। তাছাড়া কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সাধারণত কর্তৃত্ববাদী সরকার গঠিত হয়।' তিনি বলেন, 'সকলের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।' তবে আইনের মাধ্যমেই নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন অপরিহার্য। তবে নির্বাচন কমিশন গঠনের আগে কীভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে কথা বলা দরকার।' মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চাইলেই দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ কীভাবে নিশ্চিত হতে পারে এ নিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সকল দলের অংশগ্রহণে আলোচনার সূত্রপাত করতে পারেন।' নির্বাচনী পরিবেশ ঠিক হয়ে গেলে নির্বাচনী ম্যাকানিজম নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

গোলটেবিল বৈঠকে নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের যুক্ত করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন ড. হামিদা হোসেন।

আলী ইমাম মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা হলো গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো নির্বাচন। তাই একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন ছাড়া অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অসম্ভব।'

ড. শাহদীন মালিক বলেন, 'আইন প্রণয়ন করা ছাড়া নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলে তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। তাই এ অবস্থায় ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যাঁরা শপথ গ্রহণ করবেন তাদেরকে আইনি ঝামেলা পোহাতে হতে পারে।' তিনি বলেন, 'সার্চ কমিটিতে বিচারপতিদের না রাখাই ভাল। কারণ তাদের কোনো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা থাকে না।'

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থার ঘাটতি রয়েছে। জনগণের মধ্যে আশঙ্কা রয়েছে সরকার যোগ্য ব্যক্তিদের কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেবে কিনা। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগী হয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।' সাবেক রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দানে পরামর্শ দিতে পারেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

'প্রসঙ্গ জেলা পরিষদ আইন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন

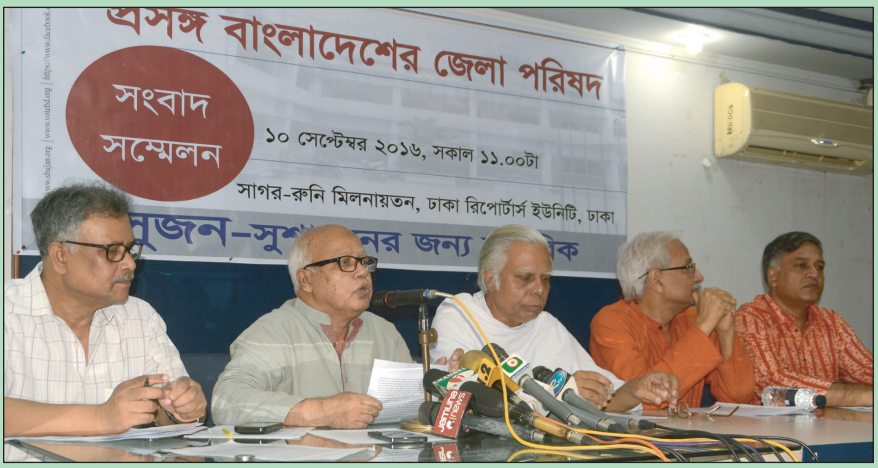

বাংলাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ, শক্তিশালী, যুগোপযোগী ও কার্যকর জেলা পরিষদ গঠনের জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর নেতৃবৃন্দ। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সকাল ১১.০০টায়, রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সুজন আয়োজিত 'প্রসঙ্গ জেলা পরিষদ আইন' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে সুজন নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, সহ-সম্পাদক জনাব জাকির হোসেন, নির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ. ড. তোফায়েল আহমেদ এবং সুজন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার

সরকার উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, '২০১৬ সালের মধ্যে জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমরা বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাই। বর্তমানে যে আইনটি রয়েছে এতে তিনটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথম ত্রুটিটি হলো, এ পদ্ধতিতে জনসাধারণ সরাসরি ভোট দিতে পারবেন না। ভোট দেবে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যগণ। প্রত্যেকটি জেলায় ১৫টি ওয়ার্ড থাকবে। এটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ব্যতিক্রম। এখানে সংবিধানের মূল চেতনা মানা হচ্ছে না। এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথেও যায় না, সংবিধানের সাথেও সাংঘর্ষিক। আরেকটি ত্রুটি হলো, সংবিধানের আওতায় সংসদ যা খুশি তাই করতে পারে, সংবিধানের বাইরে নয়। কিন্তু এ আইনে জেলা পরিষদ কী কী কাজ করবে তা সুস্পষ্ট করা হয়নি। সেখানেই সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। কেননা ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে সরকারের ১৩টি হস্তান্তরিত বিভাগ রয়েছে, উপজেলাতেই ১৭টি বিভাগ রয়েছে, কিন্তু জেলা পরিষদে তা করা হয়নি। এছাড়াও, আমাদের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে 'প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য' সম্পর্কিত দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও অন্যান্যদের সঙ্গে ডিসি/এসপিসহ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কী ধরনের সম্পর্ক হবে তা এ আইনে কিছুই বলা নেই। তৃতীয়ত, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধীনেই কর্মকর্তারা কাজ করে থাকেন। সংশোধিত আইনেও সংসদ সদস্যদেরকে জেলা পরিষদের উপদেষ্টা করার বিধান অব্যাহত রয়েছে। আমরা জানি যে, সংসদ সদস্যদের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ কাজ করতে পারছে না, সেখানে আবার জেলা পরিষদেও সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা করাটি ঠিক হয়নি। এটি আইনের আরেকটি বড় ত্রুটি।'

তিনি সরকারের নিকট তিনটি প্রস্তাব পেশ করে বলেন, 'বর্তমান আইনটি থেকে ইলেক্টোরাল কলেজ (নির্বাচকমণ্ডলী) পদ্ধতি বাদ দিতে হবে। এলাকা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা পরিষদকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে হবে। জনগণের সরাসরি নির্বাচনের অধিকার দিতে হবে। সংবিধানের ৫২ (২) এবং ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জেলা পরিষদকে কাজ দিতে হবে এবং সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা করার বিধান বাতিল করতে হবে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশে সবগুলো সরকারই অতীতে সংবিধান লঙ্ঘন করে এসেছে। বর্তমান সরকার যে জেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আমরা আনন্দিত এবং সরকারকে স্বাগত জানাই। কিন্তু সরকার আগের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০০ সালে পাশ করা জেলা পরিষদ আইনকেই সংশোধন করে পুনঃপ্রচলন করছে। আইনের পুনঃপ্রচলন দোষের কিছু নয় সেই আইন যদি যুগোপযোগী হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আগের জেলা পরিষদ আইনটি ছিল ধারণাগতভাবে পশ্চাৎপদ এবং মূলত মান্ধাতার আমলের চিন্তা-চেতনার সন্নিবেশন। এটি ছিল অনেকটা আইউব খানের 'মৌলিক গণতন্ত্রে'র আদলে গড়া।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র', যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'শাসন' প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচিত সরকারের পাশাপাশি জেলায় নির্বাচিত জেলা পরিষদ, উপজেলায় নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়নে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহরে নির্বাচিত সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা নিজ নিজ এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনা করবে।' এ সময় তিনি জেলা পরিষদেও সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানান। এছাড়া তিনি জনসংখ্যা অনুযায়ী জেলা পরিষদকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভাগ করা, নারীদের জন্য জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি প্রবর্তন করা এবং হলফনামার মাধ্যমে জেলা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আইনে সংযোজনের দাবি জানান।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, 'সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত সব ধাপই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হবে সেটাই আমাদের সংবিধানে বর্ণিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি সরকার যে আইন অনুমোদন দিয়েছে সেই আইনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটা প্রতিফলিত হবে সে ব্যাপারে আমাদের সংশয় রয়েছে। কেননা প্রত্যেক সরকার দলীয় স্বার্থে স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু আমরা জনগণের সরকারের পরিবর্তে দলীয় সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চাই না। আমরা মনে করি, অনুমোদিত জেলা পরিষদ আইনটি সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। আর তাই অধ্যাদেশ বা মূল আইন করার আগে সরকারের প্রতি আইনটি পুনরায় মূল্যায়ন করার দাবি জানাচ্ছি।'

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর

ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন-২০১৬

স্থান: ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স-বাংলাদেশ, কাকরাইল, ঢাকা

তারিখ: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬; সকাল ১০.০০টা

সুজন-এর কেন্দ্রীয়, মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক